প্রথম অধ্যায়

উপনিবেশোত্তর বাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ --উপনিবেশোত্তর চেতনার বৈশিষ্ট্য উপনিবেশোত্তর সাহিত্যে শ্রেণিবিভাজনের বাস্তব- সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

উপনিবেশোত্তরবাদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

উপনিবেশ হল কোনো জনগোষ্ঠীর দ্বারা বিদেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস বা কলোনি। এবারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে উপনিবেশ স্থাপন করে কারা? আমাদের এই দেশকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশরা। এখানে এসে তারা তাদের কলোনি স্থাপন করেছিল ।

'পোস্টকলোনিয়ালিজম' তথা 'উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ' শব্দ দুটি বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী সাহিত্য ও বৌদ্ধিক চর্চার জগতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে । উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ও উত্তর ঔপনিবেশিকতা এই শব্দগুলি সমালোচদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতেই যে যার মতো করে শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে লাগলেন বিভিন্ন সাহিত্যে, সমালোচনায়। 'কালচার অ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম' বইতে এডয়ার্ড সাঈদ সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের মধ্যে এক পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। 'সাম্রাজ্যবাদ' বলতে তিনি বোঝান "দূরের কোন অঞ্চল শাসন করছে এমন এক আদিপত্যবিস্তারী মহানগর কেন্দ্রের তত্ত্ব, চর্চা এবং মনোভাব ।"[১] 'ঔপনিবেশিকতাবাদ' বলতে তিনি বোঝান যা প্রায় সবসময়ই সাম্রাজ্যবাদের

এক পরিণাম যার অর্থ হল "দূরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন।"[২] উত্তর ঔপনিবেশিক চর্চা মূলত রেনেসাঁ পরবর্তী য়ূরোপের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে যারা কাজ করেছেন, এমন অনেক সমালোচক সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশের একটি পর্যায় হিসেবে মনে করেছেন । যেমন, প্যাট্রিক উইলিয়াম ও লরা ক্রিসম্যান লেখেন, "উপনিবেশিকতা হল অন্য মানুষের জমির অধিকার ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ যা সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক নির্দিষ্ট পর্যায়, যাকে উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরণের বিশ্বায়ন হিসেবে এখন ভালো বোঝা যায় যার মানে হল অতীতে বিশ্বের অপুঁজিবাদী অঞ্চলগুলোতে এর গভীরতা এবং সামাজিক সংগঠনের পুর্ব বা না পুঁজিবাদী রূপগুলোর ধ্বংসসাধন।"[৩] এই যুক্তি থেকে এটা স্পষ্ট কেন 'উত্তর উপনিবেশিক চর্চায়' ধারণা এত ঢিলেঢালা ছিল । উত্তর ঔপনিবেশিক উত্তর সাম্রাজ্যবাদী এইসব বিশ্বায়ন গুলোকে মূলত ব্যবহার করা হত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোর উত্তর স্বাধীনতা পর্বকে চিহ্নিত করতে।

উপনিবেশবাদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো উপনিবেশ স্থাপয়িতারা স্থায়ীভাবে উপনিবেশের কর্তৃত্ব বজায় রাখার এই মতবাদ, কলোনিয়ালিজম । আমাদের দেশে ব্রিটিশরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে তাদের মতবাদ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল । বলা যায় উপনিবেশবাদ (Colonialism) হচ্ছে আধিপত্য এবং কর্তৃত্বের চর্চা, এক মানুষের অন্য মানুষকে অধীন করা থেকেই যার সূচনা । তবে উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা দেওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা আরেকটা শব্দ সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)। অনেক সময় এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা হয় । উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

দুটো শব্দের সাথেই যুক্ত আছে একটি অধীনস্থ মানব গোষ্ঠীর উপর আরেকটি মানব গোষ্ঠীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ । তবে ইংরেজি শব্দ দুটির দিকে একটু নজর দিলে দ্বন্দ্বটা কিছুটা হলেও নিরসন করা যায় । ইংরেজি কলোনিয়ালিজম শব্দটি লাতিন 'কলোনাস' (Colonus) শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কৃষক । এই থেকেই অনুমান করা যায় যে, একটি প্রতাপশালী গোষ্ঠী যখন অন্য এক সাধারণ কৃষিজীবী গোষ্ঠীর দেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, কিন্তু ওদিকে আবার তাদের নিজেদের দেশের প্রতি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক আনুগত্য বজায় রাখে তখনই উপনিবেশবাদের সূচনা ঘটে । অন্যদিকে ইম্পেরিয়ালিজম শব্দটা লাতিন 'Imperialism' থেকে এসেছে । যার অর্থ আদেশ বা হুকুম দেওয়া । সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি নির্দেশ করে, শোষক একটা গোষ্ঠী কিভাবে অন্য গোষ্ঠীর উপর তাদের শক্তিমত্তার চর্চা করে তা সে চিরস্থায়ী বসতি স্থাপন, সার্বভৌমত্ব বা অন্য কোনো পরোক্ষ যে কোনো উপায়েই হোক না কেন ।

ব্রিটিশ উপন্যাসিক এলেক বোমার (Elleke Boehmer) এর মন্তব্য এখানে উল্লেখ করতে পারি, তাঁর 'কলোনিয়াল এ্যন্ড পোস্টকলোনিয়াল লিটারেচার' বই এ বলেছেন,

> "a settlement of territory the exploitation or development of resources and the attempt of governs the indigenous in habitants of occupied lands"[৪]

উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা দেওয়া খুব একটা সোজা কথা নয়, কারণ একে অনেক সময়ই সাম্রাজ্যবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয় । উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ দুটোতেই ইউরোপীয়দের বিশ্বদখলের প্রক্রিয়া ছিল যা

তাদের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক দিয়ে উপকৃত করতো। উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল, এবং আলজেরিয়া ইউরোপীয় স্থাপনাকে সাধারণত উপনিবেশবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় অর্থাৎ যে সব অঞ্চল সেখানে গিয়ে স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের দ্বারা শাসিত হতো ।

-উপনিবেশের পতন আর উপনিবেশোত্তর চেতনার বিকাশ এক নয় । চিন্তার ক্ষেত্রে বৈকল্য ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক । প্রান্তবাসী জনগোষ্ঠীকে বৃত্তের পরিধির মধ্যেই জীবনকে সীমাবদ্ধ না রেখে, পুঁজিবাদীদের শাসনের গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে । জ্ঞানের ও বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিতে হবে নিজেদের, আর উচ্চারণ করতে হবে,

"আমি চিনেছি আমারে, আজিকে
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ ।"[৫]

উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক বা চিন্তক হিসেবে চারটি নাম বেশি উচ্চারিত হয় ফ্রান্স ফেনন, এডওয়ার্ড সাঈদ, হোমি ভাবা, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক । ফ্রান্স ফেনন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত । ১৯২৫ সালে প্রাক্তন ফরাসী কৃতদাস উপনিবেশ মার্টানি তে তাঁর জন্ম । ১৯২৫ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম বই 'ব্ল্যাকস্কিন হোয়াইট মাক্স' যার বিষয় ছিল জাতিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তাঁর প্রভাব । 'ঔপনিবেশিক নজর' এর প্রভাবে বিশ্লেষণে দৃষ্টিকোণের যে যে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে ঐ বইতে তা দ্রুত প্রভাব ফেলেছিল কৃষ্ণকায় ও তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে । ঔপনিবেশিক

নজরের ব্যাখ্যায় তিনি ইয়োরোপীয়দের দৃষ্টি, সংজ্ঞায়ণ ও ছকবন্দী করার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন; কেননা তাদের সংস্কৃতিকে উন্নত বলে ধরেই নেওয়া হয় এবং আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতির ওপর তাদের কর্তৃত্বের অধিকার আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে থাকে । ইয়োরোপীয় উপস্থিতি ও সংস্কৃতিকে স্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে অন্যদের বিচার করা হয় এবং তাদের দেখানো হয় অস্বাভাবিক এবং বহিরাগত বা নিকৃষ্ট অথবা দুইই হিসেবে । ফেনন লিখেছেন, "একটা তথ্য আছে সাদা মানুষেরা কালো মানুষদের চেয়ে নিজেদের উন্নতর মনে করে । আর একটি তথ্য আছে কালো মানুষেরা যে কোনো মূল্যে সাদা মানুষদের কাছে প্রমাণ করতে চায় যে তাদের চিন্তার গুরুত্ব ও বুদ্ধির মূল্য সমান । এই পরিস্থিতি থেকে আমরা কিভাবে আমাদের মুক্ত করবো ?[৬] এর পাশাপাশি তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন "সাদা ও কালো জাতির সান্নিধ্যের তথ্যটি এক বিরাট মনস্তত্ত্ব ঘটিত জটিলতার সৃষ্টি করেছে।"[৭] এবং তিনি আশা করেন যে ঐ জটিলতার বিশ্লেষণই তাকে দূর করতে সাহায্য করবে । তিনি আরও মন্তব্য করেন যে "যাকে প্রায়শই বলা হয় কৃষ্ণকায় মানুষের আত্মা, তাই হল সাদা মানুষের শিল্প সামগ্রী ।"[৮] এইভাবে 'ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাক্সস' বইটি হয়ে দাঁড়ায় এক মনোবিশ্লেষণ মূলক গবেষণা, জাতি বৈশিষ্ট্যবাদের কারণ খোঁজার চেষ্টা ও আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে কৃষ্ণকায় মানুষের ওপর জাতিবৈশিষ্ট্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব এবং কিভাবে ঐ প্রভাব অতিক্রম বা মোকাবিলা করা হবে তাঁর ইঙ্গিত । সংক্ষেপে বলা যায়, ফেনন বিশ্বাস করেন যে, সমাজ যারা চালায় তাদের জাতিবৈশিষ্ট্যবাদী ব্যবহারকে কালো মানুষেরা কম বেশি স্বীকার করে নিয়েছে এবং হয় নিজেদের হীন

স্থানাংককে মেনে নিয়েছে না হয় তারা যে পুরোপুরি মানুষ ও সমকক্ষ তা প্রমাণ করার প্রয়োজনকে মেনে নিয়েছে কিন্তু এ সবই সাদা মানুষদের শর্তে।

ঔপনিবেশিক বসতিস্থাপক ও সরকার প্রচার চালিয়ে যেত যে, যে মানুষেরা তাদের দ্বারা শাসিত তারা স্ব--শাসনে সমর্থ নয় এবং তাদের জমি ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারে দক্ষ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফেনন তাঁর 'দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ' বইতে যুক্তি পেশ করেন যে, জমি ও সম্পদের ওপর তাদের অধিকার রক্ষার মনোভাব বা আগ্রহ পরিত্যাগ করা ইউরোপীয়দের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। বইটি মূলত ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করেই লিখেছেন ফেনন।

'দ্য এম্পায়ার রাইটস ব্যাক' গ্রন্থের প্রকাশনা আর 'অ্যাসোসিয়াশেন ফর কমনওয়েলথ লিটারেচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গোয়েজ স্টাডিজ'-এর বার্ষিক সম্মেলনে মূল বক্তা ছিলেন এডোওয়ার্ড সাঈদ। যাকে অ্যাংলোফোন উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠিতা বলা হয়। তাঁর বিতর্কিত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ 'ওরিয়েন্টালিজম' এ সাঈদ যুক্তি দেখান যে, যদিও এমন অনেক মানুষ ছিল এবং আছে যারা এমন এক জায়গায় বাস করে, ইয়োরোপ যাকে জানে 'ওরিয়েন্ট' বলে এই স্থান প্রকৃত কখনোই 'ধারণা' ছাড়া কিছু ছিল না "এক সৃষ্টি যার কোন অনুরুপে বাস্তবতা নেই।"[৯] সাঈদের মতে, যা ঐ বিশুদ্ধ ধারনাগত পরিসরকে অস্তিমান করে তাহলো ইয়োরোপীয় চিন্তাশৈলী যার ভিত্তি সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবধান যা তৈরি হয়েছে 'প্রাচ্য' ও 'প্রতীচ্য'-র মধ্যে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক যার মৌলিক কাজটি ছিল

আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসী ও বাংলা পাঠগুলোর বিশ্লেষণে মার্ক্সীয়, বিনির্মাণবাদী ও নারীবাদী তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা তাকেও প্রভাবিত করে। তিনি তাঁর 'নিম্নবর্গীয় কি কথা বলতে পারে ?' শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, নিম্নবর্গীয় ইতিহাস লিখন ঐতিহাসিক বিষয়ীর প্রতিনিধিত্বমূলক বিবৃত পুরোপুরিভাবে বিবেচনা নাও করে থাকতে পারে যা সে ইয়োরো কেন্দ্রিকতা থেকে পুনরুদ্ধার করতে চায়। স্পষ্টভাবে, উপনিবেশিত জনগণকে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয়ী হিসেবে, তাদের নিজস্ব ইতিহাসের বিষয়ী হিসেবে (অর্থাৎ অন্যের বুর্জোয়া ইতিহাসের নিষ্ক্রিয় চরিত্র হিসেবে নয়) বোঝার প্রকল্পটির উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্পিভ্যাকের যুক্তি আপাত অলঙ্ঘ্য এক প্রতিবন্ধকতার সমস্যা তুলে আনে। আমরা কিভাবে উপনিবেশীত জনগণকে তাদের নিজস্ব ইতিহাসের বিষয়ী হিসেবে চিন্তা করাকে পুনরুদ্ধার করবো যখন ঐসব বিষয়ী ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বোধ নির্ভর করে ঔপনিবেশিক রচনার ওপর ? স্পিভ্যাকের চূড়ান্ত উত্তর হল, আমরা পারি না। 'নিম্নবর্গ কথা বলতে পারে না।' প্রতিমান শুকিয়ে যায় নি –ঐতিহাসিক পুনরুদ্ধারের অসম্ভ্যাবতার জ্ঞানের বাইরে কাজ করা, তাঁর মতে, হল "আত্তীকরণের মাধ্যমে অপরকে কুক্ষিগত করার বিপদ"[১০] –কে মোকাবিলা করা।

উপনিবেশোত্তরবাদ জ্ঞান ও সংস্কৃতি ঘেঁষা রাজনৈতিক দর্শন। আমাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা থেকে উপনিবেশিকতার দূষণ দূর করে আত্মপরিচয় অর্জনের কথাই এদর্শনের মূল উপজীব্য। উত্তর উপনিবেশবাদে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা পুষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার কারণে

একশ্রেণির মানুষের দ্বারা অন্যশ্রেণির মানুষদের উপর যে শোষণ চালিত হয়, তা দূর করার প্রবণতা ।

-- 'উপনিবেশোত্তর' শব্দটির মানে যদিও উপনিবেশবাদী শাসন অবসান হওয়ার পরবর্তী পর্যায়, যান্ত্রিকভাবে নবীন চেতনা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগে সংগে দেখা যায় না । বরং উপনিবেশবাদ যখন শাসিতদের সমাজে দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যায়, দ্বিবাচনিক পদ্ধতিতে ঠিক সেই বিন্দুতে শুরু হয়ে যায় প্রতিবাদী চেতনার উল্লেখ পর্ব । বর্ণ বর্গ বিভাজিত সমাজে চিরকালই যেখানে অন্ধকার রয়েছে সেখানে আলোর সন্ধান পাওয়া ভার । উপনিবেশোত্তর চেতনার জ্ঞান দিয়ে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি । সেটা সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক যেদিক দিয়েই হোক উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ দিয়েই আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি । উপনিবেশোত্তরবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রাস্লার চার্লস (Bresslar Charles) বলেছেন,

> "It is an approach to Literacy analysis that consumes itself particularly with literature written in English in formally colonized countries ."[১১]

ব্রিটিশরা এদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । এবং তাদের সবকিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল । একসময় সেই উপনিবেশের স্থপতিরা যখন চলে গেল, তখন আমাদের চেতনার স্বরূপটা অন্যদিকে মোড় নিল । ব্রিটিশরা চলে গেলে আমরা আন্দোলন করতে শিখলাম, আমরা ঠিক করলাম যে আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ব; কিন্তু এই প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি সমানমানে চলেনি । আমরা অন্য উপনিবেশিকতার কবলে পড়ে

গেলাম; সেটা হল ধনতন্ত্র, ক্ষমতাশালী বা ধনিক সমাজ। দেশের অবস্থানের পরিবর্তন তেমন করে কিছু হয় নি। কলোনিয়াল প্রভুরা চলে গেলে দেখা গেল এ দেশেরই ধনিক সমাজ (টাটা, বিরলা, বাজাজ প্রমুখ) প্রভুরা বেরিয়ে এল ঠিকই; কিন্তু শোষিতদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোন কিছুরই কোন উন্নতি ঘটেনি। শোষিত শ্রেণি নিজেদের অধিকারের লড়াই আগে বোঝে নি কারণ তখন প্রভুরা ছিল বিদেশি, উপনিবেশোত্তর চেতনায় শোষিত বর্গরা লড়াই করতে শিখলেও কোনো পরিবর্তন হয়নি, এখন দেশীয় প্রভুদের দাসত্বের কবলে শোষিত শ্রেণির শোষণ একইরকম থেকে গেছে।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকেরা একদিন বিদায় নেয় ঠিকই কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো এত সহজে ভেঙে যায় না। উপনিবেশোত্তর সমাজে সৃষ্টি ও মনন যেসব বুদ্ধিজীবীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাঁদের চিত্তবৃত্তি উপনিবেশকৃত হলে অটুট থেকে যায় আধিপত্য প্রবণ প্রতিবেদন গড়ে তোলার অভ্যাস। পৃথিবীর অনেকাংশ মানুষই এখন ও ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল কাঁধে নিয়ে ফিরছে। সুতরাং উপনিবেশোত্তরবাদের স্বরূপ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলোর মতো ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিস্পর্ধী উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জেগে ওঠে এবং জেগে থাকেও। উপনিবেশিকৃত মনে জগৎ ও জীবনে সত্য ও মিথ্যা সুন্দর ও অসুন্দর সাফল্য ও ব্যর্থতা, সমস্ত বিবৃত হয় না শুধু তাঁদের ভেদ ও লুপ্ত হয়ে যায়। সময় ও পরিসর হয়ে পড়ে বিমূর্তায়িত ফলে তাঁদের কোনো চিহ্নায়ক ও ঔপনিবেশিক সন্দর্ভে প্রাসঙ্গিক থাকে না আর।

উপনিবেশোত্তর চেতনার বৈশিষ্ট্য

-- উপনিবেশোত্তর চেতনা ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য শেকল ভেঙে ফেলছে, তারই প্রতিবেদন সামাজিক ও নান্দনিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে অহরহ। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও প্রকরণকে অস্বীকার করে এবং প্রত্যাহ্বান জানিয়ে সমস্ত ধরণের পূর্বধার্য বর্গাতয়নকে চূর্ণ না করা পর্যন্ত কোনো বিকল্প মূল্যবোধের জন্ম হতে পারে না- এই হল উপনিবেশোত্তর চেতনার মৌল বক্তব্য। এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যায় এভাবে

(ক) উপনিবেশোত্তর চেতনা সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে মুখোশ থেকে মুখকে এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়।

(খ) উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মাণপন্থী।

(গ) জীবনে সংস্কৃতিতে সাহিত্যে সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভ্যাসে যত ধরণের আধিপত্য প্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে, তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে নৈঃশব্দের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙময় করে তোলা উপনিবেশোত্তর চেতনার প্রধান লক্ষ্য।

(ঘ) উপনিবেশোত্তর মূলত বহুমুখী প্রতিসন্দর্ভ তৈরি করতে চায় যাতে চিরউপেক্ষিত ব্রাত্যজন এবং নারীর নিরুচ্চার উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে।

(ঙ) উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধই নিষ্পেষিত বর্গকে নিজের অনুপস্থিতি প্রমাণ করতে সাহায্য করে।

(চ) উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জ্যামিতিক নিয়মে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগে সংশ্লিষ্ট নয়।

(ছ) উপনিবেশোত্তর চেতনা সবচেয়ে বড়ো দায় বলে গ্রহণ করে যে কর্তব্যকে, তাকে বলা যেতে পারে যাবতীয় ছদ্মবেশের উন্মোচন এবং অলীক বাস্তবতার বিনির্মাণ।

(জ) জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ত্রাসের সার্বিক বিরোধিতায় উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ শাণিত হয়ে ওঠে।

(ঝ) -সমস্ত আধিপত্য প্রবণতাকে চূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নিপীড়িত ও প্রান্তিকায়িত জনের মধ্যে; সামাজিক সম্পর্কের নামে যে পীড়নের আকরণ এবং প্রতিভাবাদর্শের বিচ্ছুরণ সর্বত্র প্রকট তাকে প্রত্যাহ্বান জানানোর জন্য প্রস্তুত হয় উপনিবেশোত্তর চেতনা।

(ঞ) আধুনিকোত্তর ভাবনার সংগে উপনিবেশোত্তর চেতনার বহুরৈখিক ও জটিল সম্পর্ক রয়েছে।

(ট) উপনিবেশোত্তর সাহিত্যতত্ত্ব বিনির্মাণপন্থী না হয়ে পারে না; স্বভাবেই তা অপ্রতিষ্ঠানিক ও চিরপ্রতিবাদী।

সমস্ত আধিপত্য প্রবণতাকে চূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নিপীড়িত ও প্রান্তিকায়িত জনের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের নামে যে পীড়নের আকরণ এবং প্রতিভাবাদর্শের বিচ্ছুরণ সর্বত্র প্রকট তাকে প্রত্যাহ্বান জানানোর জন্য

প্রস্তুত হয় উপনিবেশোত্তর চেতনা। বস্তুত পীড়ন যত তীব্র হয়, তত ব্যগ্র হয়ে ওঠে প্রতিবাদের আকাঙ্ক্ষাও ।

উপনিবেশোত্তর সাহিত্যে শ্রেণিবিভাজনের বাস্তব

--সতের থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত আফ্রিকান ও অন্যান্য উপনিবেশিত জনগণের সাব্যস্ত করা হত নিচুস্তরের কায়িক শ্রমের কাজ বা একঘেয়ে কেরানি শব্দের কাজের জন্য মানসিক ও শারীরিক উপযুক্ত হিসেবে। ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপক ও সরকার প্রচার চালিয়ে যেত যে, মানুষেরা তাদের দ্বারা উপনিবেশিত তারা স্ব শাসন সমর্থ নয় এবং তাদের জমি ও সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দক্ষ নয় । এই পরিপ্রেক্ষিতে ফেনন তাঁর 'দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ' বইতে যুক্তি দেখান যে জমি ও সম্পদের ওপর তাদের অধিকার রক্ষার মনোভাব বা আগ্রহ পরিত্যাগ করা ইউরোপীয়দের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল । 'দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ' এর ভূমিকায় জাঁ পল সার্ত্র ঘোষণা করেছিলেন যে, ফেননের লেখায় তৃতীয় বিশ্ব নিজেকে খুঁজে পায় এবং একাত্ম হয়ে নিজের সংগে কথা বলে তাঁর স্বরে ।

যন্ত্র প্রযুক্তির ঔদ্ধত্য আজ যখন উপনিবেশবাদ শৃঙ্খলিত পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সামাজিক নান্দনিক স্বকীয়তা মুছে ফেলতে চাইছে উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ সংগ্রাম ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না । অন্যভাবে বলা-যায় আপসহীন সংগ্রামী মানসিকতা এই মূল্যবোধের মৌল চিহ্নায়ক । আর যে কোনো কিছু থেকে শুধু হতে পারে ঘুরে দাঁড়ানোর পালা । অর্থাৎ কেন্দ্রিকরণ প্রবণ সন্দর্ভে হস্তক্ষেপ করে সামাজিক ও নান্দনিক প্রতাপের

অবসান ঘটিয়ে সূচনা হয় পুনঃপাঠ প্রতিসন্দর্ভ নির্মাণের আয়োজন । অসংগঠিত ব্রাত্যজনকে যদি ফিরে পেতে হয় তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর; তাহলে কেন্দ্রিয় নব্য ঔপনিবেশিক প্রতাপের আকরণকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই হবে । যে কোনো কিছু থেকে অপ্রতিষ্ঠানিক চেতনার বার্তা ঘোষণা শুরু হওয়ার পক্ষে বাধা নেই কিছু । তারপর অবশ্য বিকল্প পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করতে প্রণালীবদ্ধ ভাবে ঔপনিবেশিক মূল্যবোধকে অগ্রণী ভূমিকায় নিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই । সত্তর পরবর্তী বাংলা সাহিত্য এর প্রমাণ । জ্ঞানের প্রযুক্তি এবং প্রতাপের কৃৎ কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক যে মোটেই বহির্ভূত নয়, বরং সুচতুর ভাবে অন্তর্বৃত্ততার সমর্থন পাই গত দুই দশকে বৌদ্ধিক সমাজের চরম মেরুদণ্ডহীনতার, কাপুরুষতায় এবং সার্বিক অবমূল্যায়ন । তবু এই পচনশীল সময়ের রৌরবে ও ব্রাত্যজন ও নারীর অবদমিত কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে প্রতিসন্দর্ভের আলম্বন । মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার', 'স্তনদায়িনী', 'দ্রৌপদী' প্রতিপাঠকৃতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি আসলে উপনিবেশোত্তর পরিসর গড়েছেন উদ্ধৃত কেন্দ্রায়ণকে উপেক্ষা করে এবং এভাবে রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের জলবিভাজন রেখা । যেহেতু বিচিত্র স্বরন্যাসে পূর্ণ এক বহুত্ববাদী সময় ঘিরে রেখেছে আমাদের পৌর ও রাজনৈতিক সময়কে, ফলেই গত দুটিদশকেআমরা বুঝলাম উপনিবেশোত্তর চেতনা এক নয় অনেক ।

উপনিবেশোত্তর চেতনা সম্পৃক্ত কয়েকটি রচনার নাম হল, হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' ও 'পাতালে হাসপাতালে' ও 'খোয়াবনামা', সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরীর যৌবন' ও 'গায়ত্রীসন্ধ্যা', দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', মলয় রায় চৌধুরির 'ডুবজলে যেটুকু

প্রশ্বাস', সুবিমল মিশ্রের 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারত' ও 'হারণ মাঝির বৌ এর মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' অভিজিৎ সেন এর 'দেবাংশী' ও 'রহু চণ্ডালের হাড়', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহীন গাঙ, ও মাটির অ্যান্টেনা', ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' ও 'জ্ঞানগুরু', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'অষ্ঠচরণ ষোল হাঁটু' ও 'চতুষ্পাঠী' সৈকত রক্ষিতের 'আকরিক' ও 'উঠোরে পুতা জাগরে পুতা' অমর মিত্রের 'দানপাত্র' ও 'অশ্বচরিতা', জয়া মিত্রের 'হন্যমান' অনিল ঘড়াইয়ের 'পরীযান' ও 'নুনবাড়ি', নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট' ও 'যুদ্ধপরিস্থিতি' । উপরিউক্ত রচনাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা সত্ত্বেও একটা ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, বিষয়গুলোকে একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে ঔপনিবেশিক নির্মিতি এঁরা নিজের মতো করে সবাই প্রত্যাখান করেছেন । এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্যকে নানা প্রকরণে আখ্যানের বিবিধ বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করেছেন ।

কিংবা উত্তরপূর্বে যাঁরা লিখছেন, লেখা যাঁদের কাছে মূলত এক যুদ্ধ । যাদের ছোটগল্প সংস্করণগুলির শিকড় আসলে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরোধিতায় শুরু হয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনায় প্রোথিত হয়ে যায় । দেবীপ্রসাদ সিংহের 'রূপকথার প্রত্যাবর্তন' (১৯৯৭), অনুপ ভট্টাচার্যের 'পাখি ও পালক' (১৯৯৭), শ্যামল ভট্টাচার্যের 'জামিছলঙ' (১৯৯৯), কিশোররঞ্জন দে'র 'উৎসে আরোগ্য আছে' (১৯৯৯), দেবব্রত দেবের 'অন্য কেউ' (২০০০), রণবীর পুরকায়স্থের 'বোকা কাশীরাম কথা' (২০০১), শেখর দাশের 'কোষাগার' (২০০২), মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'কক্ষপথ'

(২০০৪), এইসব সাহিত্য শ্রমিকরা এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের সাহিত্য অধ্যবসায় অটুট রেখে চলেছেন ।

--আসল কথা হল মুক্তির পথ দেখানোর মত রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রস্তাব করা ও লেখকদের ক্ষেত্রে জরুরী । এর নজির ও আমরা দেখি রাজা রাও র কাঁথাপুরা (১৯৩৮), মূলক রাজ আনন্দের কুলি (১৯৩১), ও আনটাচেবল (১৯৩৫), এনগুগি র পেটালস অব ব্লাড (১৯৭৭), ও মাটিগারি (১৯৮৬) ইত্যাদিতে ।

'উপনিবেশোত্তর' শব্দটি কাল বা পর্যায় বাচক নয়, চেতনাদ্যোতক । তার মানে সময়ের মাপকাঠিতে উপনিবেশবাদের পরে নয় উপনিবেশোত্তর ভাবনা; এই প্রতিবাদী অবস্থান তখনই গড়ে ওঠে নিপীড়িত জনসমাজে যখন তার প্রয়োজন দেখা যায় । সাহিত্যে উপনিবেশোত্তরবাদী ভাবনা দিয়ে লেখা হয়েছে অনেক উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি । লেখা হয়েছে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ সব ভাষাতেই । নীচে তা থেকে তিনটি এরকম উপন্যাস একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে ।

হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত কথাকার প্রেমচাঁদ মুন্সী তার বিখ্যাত এবং অন্তিম উপন্যাস লিখলেন 'গোদান'। যা উপনিবেশোত্তর ভাবনার আদলে লেখা। উপন্যাস সম্পূর্ণ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্মভীরুতা, নিরাশা, অসহায়তা ইত্যাদি । তিলে তিলে তাদের কি করে কষ্টে দেওয়া হয়, ভারতের মেরুদণ্ড এই কৃষকরা কি করে জর্জরিত হয়ে পড়ে তথাকথিত শোষকের কবলে পড়ে তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'গোদান' এ । গ্রামের জমিদার, পত্র সম্পাদক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, রাজনৈতিক নেতা, রাজকর্মচারী

সবাই মিলে কি করে নিরীহ কৃষকদের শোষণ করছে, সাথে রয়েছে গ্রামের মহাজন পুরোহিতরা সেটাই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু । বলা হয়েছে এই উপন্যাস একটা সময়ের উপন্যাস, যেখানে এই শোষণগুলো এখন শেষের দিকে কিন্তু আদৌ শেষ হয়েছে কি ? যে বর্ণ বর্গ ব্যবস্থার কথা উপন্যাসে লেখক বলেছেন সেটা কি এখন নেই সমাজে ? উপনিবেশোত্তর ভাবনা নিয়ে যখন আমরা 'গোদান' পাঠ করি দেখব এখনও ঔপনিবেশিক সমাজের অবসান হয় নি । লেখক তাঁর লেখায় আওয়াজ তুলেছেন যেহেতু শোষণ আর তাঁর সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই । শোষিতদের তিনি খুব কাছ থেকেই দেখেছেন, ফলে তাঁর লেখায় প্রতিবাদের সুর ওঠে আসে । তিনি আওয়াজ তুলেছেন সেইসব শোষকবর্গের বিরুদ্ধে যারা শোষণ করে চলেছে । এবং একটা জায়গায় তিনি শোষিতদের বলেছেন যে বেঁচে থাকতে হলে বাঁচার মতো বেঁচে থাকা, মৃত হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ ? উপন্যাসে মূল চরিত্র হরি শোষকদের শাসনে সংসারের যখন আর তাঁর বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে ছিল না তখন গোদানের কথা ভেবেই সে বেঁচে ছিল । গোদানে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তবর্গ কৃষকের মহাজনী ব্যবস্থার চলতে থাকা নিরন্তর শোষণ তথ্য তাঁর থেকে উৎপন্ন সন্ত্রাসের কথা রয়েছে । হরি সেই চরিত্র সেই সমাজের প্রতিনিধি যারা দিন রাতে খেঁটে মরে অন্যদের প্রসন্ন রাখে শুধু এর জন্য যাতে তারা তাদের কষ্টের মূল্য একদিন পায় । কিন্তু শেষে সে তাঁর ফল পায় না এবং তা থেকেই শুরু হয় বিদ্রোহ ।

উত্তর উপনিবেশ নিয়ে আলোচনা করলে বিখ্যাত লেখক মূলক রাজ আনন্দ এর দুটো বই এর উল্লেখ করতেই হয় 'কুলি' এবং 'টু লিভস অ্যাণ্ড এ বাড' যেখানে লেখক চা বাগানের শ্রমিকদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক

শোষণের দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। যাদের সব সময়ই বাগান মালিকদের কাছে মাথা নত করে থাকতে হয়, মালিক পক্ষই তাদের 'মাইবাপ' । এই সাহেবেরা যা বলবে যেরকম বলবে সবই তাদের মেনে নিতে হবে । কাজের সময় ছাড়া ও চব্বিশ ঘণ্টাই যেন তারা এদের গোলাম । 'টু লিভস অ্যাণ্ড এ বাড' এ গঙ্গু এবং তার পরিবারকে ভুল কথা বলে, ছল করে আসামের চা বাগানে নিয়ে আসা হয়েছিল । এবং তারপর গঙ্গু কে অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যেমন খাওয়ার অভাব, অসুখ হলেও ওষুধ নেই ইত্যাদি । এমনকি স্ত্রী সজনী যখন মারা যায় কলেরায় তার অন্তেস্টি ক্রিয়ার জন্যও গঙ্গুকে বাগান মালিকদের কাছেই হাত পাততে হয়েছিল। লেখক আসলে বাগানের বাস্তব ছবিটাকেই তুলে ধরেছেন। গঙ্গুর মতো এমন হাজারো মানুষ রয়েছে যারা শাসক বর্গের প্রতাপের কথা বোঝে কিন্তু সেই প্রতাপের কবল থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি ।

উলগুলানের শেষ নেই, বিদ্রোহের শেষ হয় না । মহাশ্বেতা দেবীর জীবন, ইতিহাসবোধ ও সাহিত্য তিনেরই শেষ কথা এই । আধার বদলায়, প্রেক্ষিত বদলায় কিন্তু সংগ্রাম থাকে । উত্তর উপনিবেশোত্তর ভাবনা থেকেই লেখিকা লিখলেন, 'অরণ্যের অধিকার' যা আসলে বিদ্রোহেরই ইতিহাস । আদিবাসী সংগ্রামের মানুষের ইতিহাস। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখিকা লিখেছেন,

> "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বীরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহে সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যবহ। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তার জন্ম ও অভ্যুত্থান তা

কেবলমাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবহার বিরুদ্ধও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুণ্ডাও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।" [১২]

অর্থাৎ গল্প বলা নয়, বীরসার লড়াই এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অন্বেষণ এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। পীড়ন যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন সামাজিক জীবনের ক্রোধ ক্ষোভ স্বপ্ন ও শক্তির নির্যাস হয়ে উঠে এক একটি মানুষ। যেমন চৈতন্য তেমনি বীরসা।

- উপনিবেশোত্তরবাদী জ্ঞানতত্ত্ব দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যতদিন বনজঙ্গল ছিল, শিকারি আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি তত কষ্ট পায় নি। জঙ্গল তাদের খাদ্য আশ্রয়, কাঠ, শিকার এর পাশাপাশি জীবন ধারণের মানকে নির্ণয় করত। লেখিকা আরও লিখছেন,

"... ভারতজুড়ে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি--... অতীব বিপন্ন। ভারত সরকার তাদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে। প্রতিটি প্রয়োজনে ওদের ভিক্ষে করতে হয়। মূলস্রোতের কৌশল ওরা বোঝে না। ... অনেক টাকা ওদের জন্য বরাদ্দ; কিন্তু ওদের জন্য কিছুই করা হয় না। ওরা টাকা চায় না। চায় সুযোগ সুবিধা।...ওরা যে মানুষ ব্যাক্তি মানুষ, তা জানার আগ্রহ কারো নেই।...ভারত এগিয়ে চলে, ইস্পাত উৎপাদনের করে, আদিবাসীদের জমি চলে যায়, ওরা কিছু পায় না।" [১৩]

এ জন্যই লেখিকা লেখেন। আধিবাসিদের জন্য লেখেন, আদিবাসীদের হয়ে সওয়াল করেন, ঘৃণা করেন 'দিকু'দের সভ্যতাকে।

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কলোনিয়াল প্রভুরা আমাদের দেশে আসে সামন্তদের হাত ধরে। ওরা বাইরে থেকে এসেছে বলে সামন্ত জমিদারদেরকে বলে ব্যবসায়িক মনোভাবনার কাজ করেছিল প্রথমত। এই সমস্ত রাজারা তখন সামাজিক অবস্থানটাকে একেবারে নীচে নিয়ে চলে যায়, নারীত্বের অপমান, শোষণ চলতে থাকে। নারীত্বের অপমান চূড়ান্ত আকার নেয়। সতীদাহ বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ পণপ্রথা এই সমস্ত জিনিষগুলো ধীরে ধীরে একটা ব্যাধির আকার ধারণ করে। আর এসব অস্থিরতার সময়ে ইংরেজ প্রভুরা নিজেদের ঘর নিজেদের মত গড়ে নিয়েছে।

মসলিন বলে আমাদের দেশে যে সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকর্মে, ব্রিটিশরা আসার পর সেটা তাদের দেশে মেশিনে তৈরি করে নিয়ে আসে, এবং দেখা যায় মেশিন মানুষের কাজকর্ম করে দিচ্ছে, আগে যেখানে দেশে স্থানীয় ভাবে কাপড় তৈরি হতো পুতুল তৈরি হতো নুন তৈরি হত চিনি তৈরি হত কিন্তু মেশিন এসে তাঁর পরাক্রম তুমুলভাবে দেখাতে আরম্ভ করে। মেশিন একজায়গাতে ঐ একটা শহরের উপযোগী খাবার সে তৈরি করছে না সে তৈরি করছে হয়তো সারা বিশ্বের জন্য খাবার। তখন দেখা গেল খাবার বেশি হয়ে যাচ্ছে নষ্ট করা যাবে না তখন যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেশ জয় করল। নৌকো বানাল, জাহাজ বানাল, একেবারে সমুদ্রের পাড়ে পাড়ি দিয়ে যুদ্ধ জয় করার পর তাদের জিনিষ নিয়ে এল সরাসরি ভাবে আমাদের দেশে। তাদের দেশের মেশিনের করা কাপড় চোপড় নিয়ে এল আমাদের দেশে আর এদিকে আমাদের মসলিন কর্মচারিরা না খেয়ে মারা গেল।

জাহাজে করে নিয়ে যেতে লাগল আমাদের দেশের লোহা জাতীয় খনিজ পদার্থ তাদের দেশ থেকে লোহাজাত সামগ্রী বানিয়ে ফিরে আসে মুনাফার লোভে । বাণিজ্য করতে করতে একসময় দেখা গেল, ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব ধর্ম খৃষ্টানিটি নিয়ে এল দেশে, ফলে আমাদের ভাষা সংস্কৃতির উপর সহজেই একটা প্রভাব পড়ল । প্রভাব পড়ল আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপরও। ব্রাকফাস্ট, ডিনার, লাঞ্চ প্রভৃতি শব্দ এসে ঢুকে গেল আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকার মধ্যে, শাক সুক্ত আর পিঠে পায়েস লুপ্ত হতে লাগল ধীরে ধীরে । পাশাপাশি আমরা আরও কয়েকটি শব্দকে আয়ত্ত করতে শিখলাম । যা মূলত ঔপনিবেশিক চিন্তা ভাবনার অবদান । তেমনি বাঙালিরা আগে মাথায় টুপি পড়ত, সাহেবরা আসার পর সেটা বাদ পড়ল । ঠিক এরকম আমাদের চিন্তায় চেতনায় তাদের সব কিছু ঢুকিয়ে দিল কলোনিয়াল প্রভুরা । ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি এবং সেইসব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে গেলাম ঠিকই। কিন্তু পরেই ঢুকে গেলাম একটা নতুন মুখোশধারী দেশীয় প্রভুদের দাসত্বের কবলে ।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ঔপনিবেশিক শাসকরা একসময় বিদায় নেয় ঠিকই কিন্তু আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো সহজেই ভেঙে যায় না । ষাটের দশক থেকে আকরোণোত্তরবাদী ভাবনার বৈপ্লবিক প্রভাবে ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনের ইতিহাস নিবিষ্ট ভূমিকা পাঠ ও পুনঃপাঠ হচ্ছে আর গুনিজনেরা এই ভাবচেতনাকে 'উপনিবেশোত্তরবাদী সমালোচনা' বলেছেন । যার বীক্ষণ আসলে গড়ে ওঠে নিম্নবর্গীয় অন্তেবাসী জনের অবস্থানকে মান্যতা দিয়ে । শেকল ভাঙার আবেগ থেকে জন্ম নিয়েছে সার্বিক

উন্নতি ও শোষণ মুক্তির প্রেরণা । অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলোর মতো ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিস্পর্ধী উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ জেগে ওঠে । উপনিবেশের করাল গ্রাসে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে নতুন অঙ্কুর । প্রান্তিকায়িত বর্গের অবদমিত কণ্ঠস্বরকে কথা বলতে শেখায় উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদ । উপনিবেশোত্তর চেতনা সর্বপ্রথম দায়িত্ব হিসেবে মুখোশ থেকে মুখকে এবং সত্যভ্রম থেকে সত্যকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয় । উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ স্বভাবে প্রতিবাদী এবং বিনির্মাণপন্থী । জীবনে সংস্কৃতিতে সাহিত্যে সমাজের নানা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশ অভ্যাসে যত ধরণের আধিপত্য প্রবণ প্রতিবেদন গড়ে উঠেছে তাদের বিপ্রতীপে কোথায় প্রছন্ন রয়েছে নৈশব্দের আয়তন, তা আবিষ্কার করা এবং অনুপস্থিত অস্তিত্বকে বাঙময় করে তোলা এর প্রধান লক্ষ। উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধ মূলত বহুমুখী প্রতিসন্দর্ভ তৈরি করে যা চিরউপেক্ষিত ব্রাত্যজন এবং নারীর নিরুচ্চার উপস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে । ঔপনিবেশিক বা বিনির্মাণ করার মধ্যে তাই ফুটে ওঠে প্রতিবাদের ও বিদ্রোহের রাজনীতি ।

--উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্য সবার ওপরে স্থান দেয় আত্ম প্রতিষ্ঠানকে যা রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রায় সব স্থানেই জড়িত। অতীত উপনিবেশোত্তর লেখকরা নিজেদের কথা বলতে চান, অর্থাৎ উপনিবেশকালীন যার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঐতিহাসিক বোধ তৈরি হওয়া স্বশাসনে উপযুক্ত ও উৎসাহিত করবে । উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক বা চিন্তক হিসেবে চারটি নাম বেশি মনে আসে ফ্রান্স ফেনন, এডোয়ার্ড সাঈদ, হোমি ভাবা ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক । আফ্রিকান বংশদ্ভুত ফ্রান্স

ফেননের প্রথম বই ‘ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাক্সস’ যার বিষয় ছিল জাতিবাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তাঁর প্রভাব । ঔপনিবেশিক নজরের ব্যাখ্যায় তিনি ইউরোপীয়দের দৃষ্টি সংজ্ঞায়ণ ও ছকবন্দী করার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন কেননা তাদের সাংস্কৃতিক দিক উন্নত বলে ধরেই নেওয়া হয় সুতরাং আফ্রিকান ও ক্যারিবিয়ান সংস্কৃতির ওপর তাদের কর্তৃত্বের অধিকার আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে থাকে । সাধারণত ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে মান্যতা দিয়ে অন্যদেরকে অস্বাভাবিক, নিচু এবং বহিরাগত হিসেবে ধরে নেওয়া হয় । ফেনন তথ্য দিয়ে সাদা এবং কালো মানুষদের মনের কথা বলেছেন । ফেনন এটাকে মনস্তাত্ত্বিক জটিল দিক বলেছেন এবং তাঁর ‘ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাক্সস’ বইয়ে মনোবিশ্লেষণাত্মক গবেষণা এবং জাতি বৈশিষ্ট্য ও উপনিবেশোত্তরবাদের প্রভাবকে অতিক্রম করার ইঙ্গিত রয়েছে ।

সংস্কৃতি সবার জন্য হয় না বরং সংস্কৃতি যখন সবার নির্মিতি হয় তখনই তা সবার হয়ে ওঠে । যারা বিশ্লেষণ করে দেখতে চান না সংস্কৃতিকে, তাদের কাছে যুগযুগ ধরে সংস্কৃতির নির্যাস মোটামুটি অপরিবর্তনীয় থাকে ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেল যে এটি একটি তত্ত্বকথা, যার একটি প্রায়োগিক দিকও দরকার ।

তথ্যসূত্র

১। Culture and Imperialism, Edward W. Said,Vintage Books, A Division of Random House, Inc. New York (বাংলা অনুবাদ) ।

২। Culture and Imperialism, Edward W. Said,Vintage Books, A Division of Random House, Inc. New York (বাংলা অনুবাদ) ।

৩। উত্তর ঔপনিবেশিকতা ও বাংলা সাহিত্য, ক্রোড়পত্র, কয়েকটি সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী ।

৪। Colonial And Postcolonial Literature: Bochmer Elleeke, Oxford and New York: Oxford University Press 1995 ।

৫। বিদ্রোহী কবিতা, কাজী নজরুল ইসলাম,অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৪, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা ।

৬। Black Skin And White Masks, Frantz Fanon, Translated by Charles Lam Markmann, Forewords by Ziauddin Sardar and Homi K . Bhabha, PLUTO PRESS, www.plutobooks.com

৭। Black Skin And White Masks, Frantz Fanon, Translated by Charles Lam Markmann, Forewords by Ziauddin Sardar and Homi K . Bhabha, PLUTO PRESS, www.plutobooks.com

৮। Black Skin And White Masks, Frantz Fanon, Translated by Charles Lam Markmann, Forewords by Ziauddin Sardar and Homi K . Bhabha, PLUTO PRESS, www.plutobooks.com

৯। Orientilism, New York: Edward Said, Pantheon Books, 1978; Vintange Books, 1979 ।

১০। 'Can the Suballturn speak?', Gayatree Chakroborty Spivak . (বাংলা অনুবাদ) ।

১১। Literary Criticism: An Introduction to theory and practice, Newjersely: Bressler Charles E, practice Hall, 1999, page-265 ।

১২। অরণ্যের অধিকার, মহাশ্বেতা দেবী, কলকাতা ১৪০৫, পৃষ্ঠা, ৭১ ।

১৩। -মহাশ্বেতা দেবীর জীবনপঞ্জি, 'মহাশ্বেতা', পৃষ্ঠা ২৩৭ ৩৮ ।